মানুক দেওতার রহস্য সন্ধানে

অজেয় রায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

'সে কিরে, ব্যাংকক!' তপনের বন্ধুরা শুনে আঁতকে উঠল।

'কেন, তাতে কি?' তপন দৃঢ়স্বরে জানায়, 'লোকে ইউরোপ—আমেরিকায় যাচ্ছে না? পড়তে যাচ্ছে, চাকরি করতে যাচ্ছে। এ-তো ঢের কাছে। ব্যাংকক চমৎকার শহর। আর সুনীলদা বলেছে চাকরিটাও ভালো। এক পাঞ্জাবী ব্যবসাদার ওদেশ থেকে মশলা নিয়ে ভারতে চালান দেয়। ওর ব্যাংকক অফিসের জন্য একজন বিশ্বাসী লোক চাই। ভালো মাইনে দেবে। অনেক বাঙালি থাকে ওখানে। সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের কদ্দিনের যোগাযোগ জানিস?'

সব শুনে বন্ধুরা ঘাড় নাড়ল, 'তা বটে, তা বটে। ঠিক আছে, যা, দেখ কেমন লাগে। ছুটি টুটি দেবে তো?'

'অত দূরে?' মা খবরটা শুনে তপনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন। তপনের বাবা নেই। মা একটা স্কুলে পড়ান।

তপন বলল 'কিছু দূরে নয়। তুমি ভেবোনা মা। সুনীলদা অ্যাদ্দিন রয়েছেন।'

'বেশ, যা তবে। সাবধানে থাকবি। তোর বাবা থাকলেও বারণ করতেন না। খুশিই হতেন।'

বি. এ পাস করে দু-বছর ধরে চাকরি খুঁজছিল তপন। হঠাৎ বন্ধু গুরুপদর পিসতুতো দাদা সুনীল ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ। সুনীলদা মালয়েশিয়ায় থাকেন। সেখানে স্কুলে পড়ান। ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। সুনীলদা কথায় কথায় বললেন, 'আমার বিশেষ পরিচিত ব্যাংককের ব্যবসায়ী গোবিন্দ সিং একজন লোক খুঁজছে। যাবে ব্যাংকক? তাহলে তোমার জন্য লিখি।'

তপন রাজি হয়ে গেছে।

তপনের ভাই-বোন তিলু মিলু খবরটা শুনেই লাফাতে লাগল। তিলু তক্ষুনি ম্যাপ নিয়ে বসে গেল, 'থাইল্যান্ডের রাজধানী, তাই না? এই তো ব্যাংকক। কিসে যাবে দাদা? প্লেন, না জাহাজে?'

মিলু বলল, 'দাদা, ওঙ্কারভাট দেখতে যাবে না?'

তপন বলল, 'ইচ্ছে আছে। ব্যাংককের কাছেই তো।'

'উঃ, কি লাক তোমার! গভীর বনের মধ্যে বিরাট ধ্বংসাবশেষ নগর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির। আমি বইয়ে ছবি দেখেছি। প্রায় হাজার বছর আগে হিন্দু-রাজত্ব

ছিল ওখানে। আর জান দাদা, ওদেশের বাটিকের কাজ খুব সুন্দর। ছুটিতে আসার সময়—আমার জন্যে একটা....'

বাইরে বেপরোয়া ভাব দেখালেও প্রথমটা ভিতরে ভিতরে বেশ ঘাবড়াচ্ছিল তপন। কলকাতায় বাইরে বড় একটা যায়নি সে। দিনে দিনে মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠে। ভ্রমণ কাহিনী বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়তে পড়তে মনে মনে বইয়ের চরিত্রদের পাশে নিজেকে কল্পনা করেছে। ওই সব অজানা দেশে বিচিত্র সব ঘটনার মধ্যে নিজেও যেন জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই কল্পনার জগৎ যে খানিকটা বাস্তবে ফলে যেতে পারে তা কোনও দিন আশা করেনি। এই কলকাতা, এই ভবানীপুরের এত দিনের জীবন ছেড়ে কোথায় যেতে হবে?

মনে সে সাহস আনে। কেন, এই তো সুনীলদা গিয়েছেন? বাবা নাকি পাস করেই বর্মায় গিয়েছিলেন চাকরি নিয়ে। চার বছর ছিলেন। ওঁরা শহরের লোক ছিলেন না। আর সে খাস কলকাতায় মানুষ। কত বেশি জানে-শোনে। তার অত ভয় কি?

ভালো মাইনে। বাড়িতে বেশ কিছু টাকা পাঠানো যাবে। সেকি কম আনন্দের কথা? তাতেই সব কষ্ট সয়ে যাবে।

মাসখানেকের ভিতর গোবিন্দ সিং-এর চিঠি এল। চাকরি মঞ্জুর। তপনের পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি হয়ে গেল। সিং ব্রাদার্সের কলকাতায় বড়বাজারের অফিস থেকে তপনকে দেওয়া হল ব্যাংকক যাবার একখানি প্লেনের টিকিট। যাওয়ার দিনও এসে পড়ল।

মায়ের চোখ ছলছল। বন্ধুরা ঘটা করে একটা বিদায় সম্বর্ধনা দিয়ে ফেলল তপনকে। তারপর সত্যি একদিন তপন রওনা দিল দমদম থেকে ব্যাংককের পথে।

ব্যাংকক। থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের রাজধানী।

তপন এক মাস হল ব্যাংককে এসে কাজে যোগ দিয়েছে।

সিং ব্রাদার্সের মালিক গোবিন্দ সিং-এর বয়স প্রায় ষাট। শক্ত সমর্থ সর্দারজি। বহু দেশ ঘুরেছেন, অনেকগুলো ভাষা জানেন, দিলদরিয়া লোক। তপনের সঙ্গে কথা বলেন ইংরিজি বা হিন্দিতে। মেনাম নদীর কাছে রাজাবংশী রোডে সিং ব্রাদার্সের মস্ত গুদাম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগুনতি ছোট বড় দ্বীপ। অনেক দ্বীপেই নানারকম মশলার গাছ জন্মায়। তাই ইউরোপীয়ানরা এইসব দ্বীপকে বলত স্পাইস্—আইল্যান্ডস্। সিং ব্রাদার্স এই অঞ্চলের নানা জায়গা থেকে লবঙ্গ

গোলমরিচ, জায়ফল, এলাচ ইত্যাদি আমদানি করে। বড় বড় নৌকো আর লঞ্চে করে নদী পথে ব্যাংককে আনে। সেগুলো জমা হয় গুদামে, তারপর চালান যায় ভারতবর্ষে। আবার ভারত থেকে সিং ব্রাদার্স আনে রেশম ও চা। মালের হিসেব রাখা, নদীর ঘাট থেকে জিনিস ছাড়িয়ে আনা। সব কাজই করতে হয় তপনকে। এসব ব্যাপারে তার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে মন দিয়ে শেখে, মশলার রকমফের চেনে।

গোবিন্দ সিং থাকেন নিউ রোডে। গুদাম থেকে বেশি দূরে নয়। তপনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ রোডে, গোবিন্দ সিং-এর বাড়ির কাছেই। খায় একটা পাঞ্জাবী হোটেলে—ভাত রুটি সব্‌জি ডাল তরকারি। দইও মেলে।

তপন সপ্তাহে একখানা চিঠি দেয় বাড়িতে। মাকে লেখে—'কিছু ভেব না। দিব্যি আছি।' তিলু মিলুকে লেখে ওই দেশের খবর—

'ব্যাংকক বিরাট শহর, মেনাম নদীর দু-ধারে ছড়ানো। পুব পাশেই শহর বেশি জমজমাট। নদী থেকে অনেকগুলো খাল বেরিয়ে ঢুকে গেছে শহরের ভিতর। খালগুলোর ওপর দিয়ে অজস্র সাঁকো। থাইরা খালকে বলে কেলাং। বইয়ে পড়েছিস তো, ইটালির ভেনিস শহরে যেমন খাল আছে তেমনি। এই খালগুলোকে রাস্তাও বলা চলে, কারণ তাই দিয়ে চলে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকো, লোকজন জিনিসপত্র নিয়ে। নৌকোর ওপর রীতিমতো বাজার বসে। নাম দিয়েছে— ফ্লোটিং মার্কেট। মাসখানেকে এত বড় শহরের কতটুকুই বা দেখেছি।'

'কলকাতার মতোই এর কোনও অংশে আধুনিক বাড়িঘর হোটেল, চওড়া ঝকঝকে রাস্তা, আবার কোনও কোনও অংশে গলিঘুঁজি বস্তি, পুরোনো নোংরা ঘুপচি বাড়ি, দোকানপাট। মেনাম নদীতে নৌকো, বজরা, স্টিমার গিজগিজ করে। শ্যাম উপসাগরে পড়েছে মেনাম। বড় জাহাজ মোহনার বেশি ঢুকতে পারে না।'

'এদেশে বেশির ভাগ লোকই বৌদ্ধ। সাত-আটশো বছর আগে এখানে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল। তাই শহরে ছড়িয়ে আছে এই দুই ধর্মের নিদর্শন। পথের ধারে কত যে বৌদ্ধ মন্দির বা ওয়াট। ঢালু ছাদ, ছুঁচালো মাথা, প্যাগোডা চেহারার মন্দিরগুলি। মন্দিরের গায়ে কেবল বুদ্ধমূর্তি—নানান আকার, নানান ছাঁদ দেখে দেখে একঘেয়ে লাগছে।'

'পথের নাম দেখে ভারী মজা লাগে। মহারাজ রোড, রাম এক, রাম দুই, এমনি সব নাম। আগে এখানকার রাজাদের নাম ছিল নাকি রাম দিয়ে। প্রাচীন রাজধানীর নাম অযোধ্যা। ঘুরতে ফিরতে বিদেশ বলে মনে হয় না।'

'কত দেশের লোকের বাস। বিদেশীদের মধ্যে চিনারাই সব চেয়ে বেশি। বেশির ভাগ লোক বাইরে প্যান্ট-শার্ট পরে। তাছাড়া পাজামা লুঙ্গি কুর্তা এমন কি ধুতি পরা লোকও দেখেছি। পথেঘাটে ঘোরে প্রচুর হলুদ আলখাল্লা-পরা পুরুষ। এরা নাকি শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। শুনেছি প্রত্যেক বৌদ্ধ থাই অন্তত কিছু দিনের জন্য সন্ন্যাস নেয়, শ্রমণ হয়। থাইরা বেশ আমুদে। চিনা প্যাটার্নের চেহারা। জানিস, এ দেশের টাকার নাম ভাট। আমাদের প্রায় চল্লিশ পয়সার সমান এক ভাট।'

শান্ত ভদ্র তপনকে গোবিন্দ সিং-এর পছন্দ হয়েছে। গোবিন্দ সিং-এর সঙ্গে থাকেন তাঁর স্ত্রী এবং ছোট ছেলে। ছেলের বয়স বছর পঁচিশ। বাবার ব্যবসা দেখে। বড় ছেলে গেছে কানাডা, কাগজ তৈরি শিখতে। ফিরে এসে এখানে কাগজের কল বানাবে।

সময় পেলে গোবিন্দ সিং গল্প করেন। তিনি তপনকে কখনো ডাকেন তপনবাবু, কখনো শুধু বাবু। বলেন, 'কত দেশ দেখলাম, কত কী শিখলাম, বড় ছেলে ফিরে এলে আমার ছুটি। আর দু'তিন বছর। তারপর দেশে চলে যাব, লুধিয়ানা। খেত-খামার করব। তখন ইচ্ছে হলে তুমি চলে যেও আমার কলকাতার অফিসে। ওখানে ভালো লোক দরকার।'

তিলু মিলুকে লিখল তপন-

'কয়েকটা নামকরা বৌদ্ধ মন্দির দেখে ফেলেছি। যেমন ওয়াট পো, ওয়াট অরুণ, ওয়াট ফ্রা-কিও। ফ্রা-কিওতে আছে বিখ্যাত এমারেল্ড বুদ্ধ। মন্দিরগুলোয় বিষ্ণু, গরুড়, কিন্নর, ড্র্যাগন ইত্যাদির মূর্তি। বড় বড় মন্দিরে সোনা আর মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। আর দেখেছি রাজপ্রাসাদ ও মিউজিয়াম। একটা ছুটির দিনে প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা দেখতে যাব। ঘোরার সময় তেমন পাই না। এত রাস্তা, ভয় হয় পথ না হারাই। পকেটে ব্যাংককের একটা ম্যাপ রাখি। হ্যাঁ, মিলু ঠিক বলেছিলি, এখানে কাপড়ের ওপর বাটিকের কাজ চমৎকার। থাইরা ঘরে ঘরে বাটিক করে। নিয়ে যাব তোর জন্যে'।

এই অযোধ্যা দেখতে গিয়েই এক রবিবার তপনের সঙ্গে আলাপ হল ডঃ ইন্দ্র দত্তর। ফলে তার জীবনে আর একটা চমকপ্রদ মোড় ফিরল।

ব্যাংককের উত্তরে অযোধ্যা। সকালে ট্রেনে চড়ে রওনা দিল তপন। ঘণ্টা দুই লাগল পৌঁছতে। মেনাম নদীর ভিতর কয়েকটি দ্বীপ এবং নদীর দুই তীরে ছড়িয়ে

আছে এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। প্রায় দুশো বছর আগে বর্মীদের আক্রমণে এই নগর ধ্বংস হয়।

তপন ঘুরে ঘুরে দেখছিল। আরও অনেক ট্যুরিস্ট এসেছিল। একটি লোককে তার বিশেষ ভাবে নজরে পড়ল।

ভদ্রলোক অন্তত ছ-ফুট লম্বা। শক্ত গড়ন, ফর্সা রং, সুশ্রী ধারালো মুখ। জুলপি ও রগের চুলে সামান্য পাক ধরেছে। পরনে ট্রাউজার্স ও ফুলসার্ট, মাথায় সাদা পানামা টুপি।

ভদ্রলোক মোটেই পুরোনো মন্দির বা প্রাসাদ দেখছিলেন না। দূরবীন চোখে লাগিয়ে গাছে গাছে পাখি দেখে বেড়াচ্ছিলেন। চারপাশের লোকজন সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ নেই।

তপনের কৌতূহল হয়। সে ভদ্রলোকের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। এইরকম দূরবীন দিয়ে পাখি দেখার ব্যাপারটায় তার আগ্রহ ছিল। তার এক মামার ছিল এই শখ। উনি আসামে থাকেন। একবার কলকাতায় এসে তপনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ঢাকুরিয়ায় পাখি দেখতে। ইনিও বোধহয় পক্ষীবিদ।

জায়গাটা নিরালা। ভদ্রলোক চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে ফিরলেন। তপন হাত কুড়ি পিছনে। তপনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত দেখে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাঙালি'?

তপন চমকে থতোমতো খেয়ে ঘাড় নাড়ল।

'বেড়াতে এসেছেন'?

'না। মানে আমি ব্যাংককে থাকি,' জবাব দিল তপন।

'ও! কী করেন?'

'চাকরি।'

'হুঁ। ঠিক চিনেছি বাঙালি।' ভদ্রলোক হাসি মুখে এগিয়ে এলেন।

'কী করে বুঝলেন?'

'খানিকটা চেহারায়, আর খানিকটা কথা শুনে। তখন নিজের মনে বিড়বিড় করছিলেন যে বাংলায়।'

'আপনিও কি বাঙালি?' তপন জিজ্ঞেস করল।

'না, তা ঠিক নয়। আমি থাই,' বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন।

'মানে!' তপন ভ্যাবাচাকা খায়।

'মানে জন্মসূত্রে বাঙালি বটে কিন্তু এই দেশের নাগরিক, এই দেশেই মানুষ হয়েছি। আমার নাম ইন্দ্র দত্ত।'